আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ

সঙ্গীত নিয়ে কথা

অজয় রায় ও অভিজিৎ রায়

এ বছরটিকে জাতিসংঘ 'বিশ্ব পদার্থবিদ্যা বছর ২০০৫' ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণার পশ্চাৎপট হল ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন ৩টি যুগান্তকারী গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলন তার শতবর্ষপূর্তিতে। এই তিনটি অবদান আমাদের চিরায়ত পদার্থবিদ্যা ও দর্শনের ভিতকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। এগুলো সংক্ষেপে হল :

(ক) আলোর কোয়ান্টাম প্রকৃতি এবং আলোক তাড়িত প্রক্রিয়া,

(খ) ইতস্তত ব্রাউনীয় গতি এবং অণুর অস্তিত্ব এবং

(গ) চলমান বস্তুর তাড়িত চৌম্বক আচরণ এবং বিশেষ আপেক্ষিকতা।

প্রথম প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রস্তাবনা 'আলো যে শক্তির গুচ্ছ কণা' তা প্রতিষ্ঠা পেল আলোকতাড়িত প্রক্রিয়া ও অন্যান্য প্রতিভাসের চমৎকার ব্যাখ্যার মাধ্যমে। দ্বিতীয় পত্রটির বক্তব্যের মাধ্যমে আইনস্টাইন দেখিয়েছিলেন যে, সংখ্যায়নিক পদ্ধতি প্রকৃতিকে জানার একটি শক্তিশালী অস্ত্র যা প্রয়োগ করে শুধু অণুর অস্তিত্ব নয়, এর মাত্রার পরিমাণগত ধারণাও পাওয়া যায়। আর তৃতীয় পত্রের প্রস্তাবনা আরও বিপ্লবাত্মক– আমাদের চেনা স্থির বিশ্বের চেহারাটিকেই পাল্টে দিল, আমাদের স্থান-কালের ধারণায় নিয়ে এল তাৎপর্যময় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। স্থান ও কাল আলাদা আলাদা শাশ্বত সত্তা নয়। স্থান-কাল একটি একক সত্তা যা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এবং জড় বা বস্তু অপেক্ষও নয়। অর্থাৎ স্থান-কাল ও জড় পরস্পরকে জড়িয়ে রয়েছে। জড়ের উপস্থিতিতে স্থান-কালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটে। এই নতুন জ্যামিতিক দৃষ্টিভঙ্গি মাধ্যাকর্ষণকে তুলে ধরল নতুনভাবে যা নিউটনীয় ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। মহাকর্ষ হল স্থান-কালের জ্যামিতিক বিকারের প্রকাশ। এই বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের পথ ধরেই এল আইনস্টাইনের সর্বজনীন বা সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব। এর আলোকে দেখলে মহাবিশ্ব আর স্থির নয়– সদা সম্প্রসারণশীল। বিজ্ঞানীদের গবেষণার মধ্য দিয়ে বের হয়ে এল 'বিগ ব্যাং' অর্থাৎ মহাবিশ্বের সূচনা এবং কৃষ্ণ গহ্বরের অস্তিত্ব– যা আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বেই লুকিয়ে ছিল।

সারা বিশ্বে নানাভাবে এ বছরটি পালিত হচ্ছে, মুখ্যত আইনস্টাইনের বড় বড় কাজগুলোকে ঘিরে। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন একজন সঙ্গীতপিপাসু রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন– চমৎকার বেহালা বাজিয়ে সুরের অন্তর্লোকে ডুবে যেতেন। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকালে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সঙ্গীত নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন। সেই ছবিটিই আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরতে চেয়েছি।

জার্মানির এক ছোট্ট শহর ক্যাপুথ। সেখানে ১৯৩০ সালের এক মনোরম গ্রীষ্মের নরোম বিকেলে বিংশ শতাব্দীর অসামান্য দুই শ্রেষ্ঠ মনন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আলবার্ট আইনস্টাইনের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী-ভারতের এ দুই মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি ছিল আইনস্টাইনের গভীর শ্রদ্ধাবোধ, অন্যদিকে তাঁরা উভয়েই আইনস্টাইনের মধ্যে দেখেছিলেন জ্ঞানের প্রজ্বলিত শিখা ও প্রবল শক্তি। এই তিনজনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকলেও মানবিকতাবোধ ও শান্তির বিশ্ব তৈরির নিরলস চেষ্টা তাঁদেরকে যেন এক মোহনায় নিয়ে এসেছিল। বিশ্ব শান্তির অন্বেষায় আইনস্টাইনের একটি চমৎকার উক্তি আছে :

"যেসব আদর্শ আমার চলার পথকে আলোকিত করেছে এবং জীবনকে আনন্দের সাথে মুখোমুখি হতে কালে কালে আমার জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে দেখা দিয়েছে– সেগুলো হচ্ছে 'দয়া, সৌন্দর্য, আর সত্য'।" রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীও এসব মূল্যবোধের আলোয় নিজেদের চলার পথকে আলোকিত করেছিলেন।

সম্ভবত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-প্রতিভা আইনস্টাইন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন ছিল অনেকটা এরকম :

"আইনস্টাইনকে প্রায়শ বলা হয়ে থাকে নিঃসঙ্গ পথিক। দৈনন্দিন জীবনের হাজারো সাধারণ ঝামেলা থেকে গণিতের জগতে আত্মনিমগ্ন থেকে তিনি চাইতেন মনকে প্রসারিত করতে, উন্মুক্ত করতে মহাবিশ্বের সীমাহীন আঙ্গিনায়। আর এ কারণেই, আমার মনে হয়, তিনি নিভৃতচারী হয়ে পড়েন। তাঁর এই একাগ্র গণিত সাধনাকে বলা যেতে পারে– 'মনুষ্যজ্ঞানাতীত বস্তুবাদ', যা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল অধিবিদ্যার প্রান্তসীমায়– যেখানে তিনি নিজের স্বার্থের জগতের সকল বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। আমার কাছে মনে হয়, আমাদের জৈবিক চাহিদার অনেক উর্ধ্বে, 'বিজ্ঞান আর শিল্প' উভয়ই হল আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ এবং ধারণ করে আছে আমাদের সর্বোত্তম মূল্যবোধ। আইনস্টাইন ছিলেন একজন চমৎকার সন্ধানী প্রশ্নকারী। আমরা অনেক্ষণ ধরে কথা বলেছিলাম এবং আন্তরিকতার সাথে, নানা বিষয়ে। এর মধ্যে ছিল 'মানুষের ধর্ম' সম্পর্কে আমার ধারণা নিয়ে ঔৎসুক্যময় মনোজ্ঞ আলোচনা। এই কথোপকথনের মাঝখানে মাঝে মধ্যেই ছিল তাঁর নিজস্ব সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীক্ষ্ণ মন্তব্য এবং তাঁর এই প্রশ্ন থেকে আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি তাঁর নিজস্ব চিন্তার স্রোতধারা কোনদিকে বইছে।'

অন্যদিকে আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন–

'প্রয়োজন আর অন্ধকার থেকে উঠে আসা মানুষগুলো অস্তিত্বের জন্য কি ক্লান্তিকর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তা আপনি জানেন। আপনি গভীর ধ্যানমগ্নতায় ও সৌন্দর্যের কারুকার্যতার মধ্যদিয়ে মুক্তির সন্ধান করছেন। এসব চর্চার মাধ্যমে আপনার দীর্ঘ সফল জীবনের মধ্য দিয়ে মানবতার সেবা করে চলেছেন, সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছেন একটি সুশান্ত উৎসাহ ও জীবনীশক্তি– যা আপনার জনগণের মধ্যে বিজ্ঞজনেরা ঘোষণা করেছেন।'

আবারও আইনস্টাইন কবিগুরু সম্পর্কে উচ্চারণ করেছেন-

'...আমাদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছেন আত্মশক্তির, আলোর এবং ঐকতানের জীবন্ত প্রতীক – মহান মুক্ত বিহঙ্গসম প্রবল ঝড়ের মধ্যেও উচ্চাকাশে উড্ডীন– অনন্ত নিত্যতার সঙ্গীত যেন অ্যারিয়েল তাঁর বীণায় সুরের ঝংকার তুলছেন, অবিচ্ছিন্ন ভাবাবেগের সমুদ্রের ওপরে ওঠে। কিন্তু তাঁর শিল্প কখনও মনুষ্যত্বের ক্লেশের প্রতি বা সাধারণ মানুষের সংগ্রামের প্রতি উদাসীন ছিল না। মনুষ্যত্ব রক্ষায় তিনি 'মহান প্রহরী'। যা কিছুর জন্য আমরা, বা আমরা যা কিছু সৃষ্টি করেছি তার মূল ও শাখা-প্রশাখা অন্তর্নিহিত রয়েছে ঐ মহতি গঙ্গার কবিতা ও ভালবাসায়।'

www.mukto-mona.com

১৯৩০-৩১ সালের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের এই দুই মনীষীর মধ্যে মোট চারবার দেখা হয়েছিল। প্রথমটি ঘটেছিল ১৯৩০ সালে জুলাই মাসের ৪ তারিখে বার্লিনের উপকণ্ঠে শহরতলীতে ক্যাপুথে আইনস্টাইনের বাসায় ছোট টিলার ওপরে। বাসাটি ছিল বাদামি কাঠ দিয়ে তৈরি– ওপরে লাল টালির ছাদ। আর চারদিকে অতন্দ্র প্রহরীর মত সারি সারি পাইন গাছের সমাহার। সে সময় দুজনেই নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন – রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে, ১৯১৩ সালে, আর আইনস্টাইন ১৯২১ সালে পদার্থবিদ্যায়। ৪২ বছরের আইনস্টাইন টিলার ওপর থেকে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন তাঁর ৭২ বছর বয়স্ক অতিথি রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানাতে। সে মুহূর্তের ছবিটি রবীন্দ্রনাথ পরে এভাবে রোমন্থন করেছেন,

'তাঁর ঝাঁকরা শুভ্র কেশ, তাঁর জ্বলন্ত চোখ, তাঁর উষ্ণ আচরণ আমাকে আবারও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এই মানুষটির মানবিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে– যিনি জ্যামিতি আর গণিতের বিমূর্ত জগতে কত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে থাকেন।'

কবি আরও মনে রেখেছেন তাঁর সারল্যে

অভিভূত হয়ে,

তাঁর মধ্যে কোন আড়ষ্টতা আমি লক্ষ্য করিনি, দেখিনি কোন ধরনের বুদ্ধিজীবীসুলভ নিস্পৃহতাও। তাঁর মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি এমন একটি মানুষকে যিনি মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককে মূল্য দিয়ে থাকেন এবং আমার প্রতি ছিল অপার ঔৎসুক্য ও আমাকে বুঝবার অদম্য আগ্রহ।'

বলা যায় সব দিক থেকেই এই দুটি মানুষ ভিন্ন প্রকৃতির ঃ জাতীয়তা, সাংস্কৃতিক পটভূমি, পেশা ও চিন্তা-চেতনায়। কিন্তু তবুও একে অন্যকে জানার এবং দুজনে দুজনের অবদানকে বুঝবার, তাঁদের সত্য সন্ধানের পথকে জানার এবং উভয়ের সঙ্গীতের প্রতি ভালবাসার উৎস কোথায় তা জানতে– উদগ্র আগ্রহ নিয়ে আলোচনায় মত্ত হলেন ঐকতানে।

তাঁদের আলোচনায় স্থান পেয়েছিল দুটি মানুষের সৃষ্টিশীলতা, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, এমনকি শিল্পের প্রতি তাঁদের ঔৎসুক্যবোধ।

আইনস্টাইনের সাথে ঐ একই বছরে ১৯ আগস্ট তারিখে কবির দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটে একই স্থানে। প্রথম দিকে প্রকৃতি ও সত্য নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও পরে তাঁদের মধ্যে পশ্চিমী ও ভারতীয় সঙ্গীত নিয়ে আন্তরিক আলোচনা চলে দীর্ঘক্ষণ ধরে। উভয় সাক্ষাৎকালেই আইনস্টাইনের এক নিকটাত্মীয়া দিমিত্রি ম্যারিয়ানোফ উপস্থিত ছিলেন এবং উভয়ের সংলাপের রেকর্ড রেখেছিলেন। দিমিত্রির বর্ণনা অনুযায়ী আইনস্টাইনের মহান অতিথি বিকেল চারটায় উপস্থিত হলে আইনস্টাইন টিলা থেকে নিচে নেমে এসে কবিকে অভ্যর্থনা জানায়। উভয়ে পাশাপাশি হেঁটে চলছিলেন রাস্তা ধরে। কবির পরনে ছিল হাল্কা নীল রংয়ের স্যুট- তিনি ধীর পায়ে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, একটি হাত বাঁকা করে পেছনে রাখা। তার পাশে হেঁটে চলেছেন শক্ত সমর্থ ঋজু আইনস্টাইন .. .. ।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন দিমিত্রি, 'the poet with the head of a thinker', আর আইনস্টাইনকে লক্ষ্য করে উক্তি করেছেন, 'the thinker with the head of poet'। তিনি আরও বলেছেন কথোপকথনটি ছিল 'যেন দুটি গ্রহের মধ্যে আত্মমগ্ন আলাপচারিতা'। ম্যারিয়ানোফ প্রথমে এই সাক্ষাতের একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনে ১০ আগস্ট তারিখে, ১৯৩০ সালে প্রকাশ করেছিলেন। শিরোনাম ছিল : 'আইনস্টাইন এবং রবীন্দ্রনাথ গভীর সত্যের সন্ধানে : বিজ্ঞানী ও কবির ভাব বিনিময়– মনুষ্যত্ব সম্পর্কহীন সত্যের অস্তিত্বের সম্ভাবনা' (Einstein and Tagore Plumb the truth: Scientist and Poet Exchange Thoughts on the possibility of its Existence without relation to humanity)। দিমিত্রি বলেছেন যে প্রথম দিনের আলোচনা পর্বটি চলেছিল 'সত্য ও বাস্তবতার প্রকৃতিকে' ঘিরে। আইনস্টাইনের অবস্থান অনেকটা ছিল 'সত্য অথবা সৌন্দর্য কি মানুষের অস্তিত্ব অনপেক্ষ নয় ?' তাহলে কি মানুষ না থাকলে 'বেলভেদরের অ্যাপোলো'র সৌন্দর্যের অস্তিত্ব থাকবে না – এই ছিল বিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসা। জবাবে কবির উত্তর ছিল 'না'; তিনি আরও বলেছিলেন যে মানুষের মধ্য দিয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়:

'যদি এমন কিছু সত্য থাকে যা মানব মনের কাছে যৌক্তিক সম্পর্ক হিসেবে ধরা না পড়ে, - তাহলে এ ধরনের সত্যের কোন তাৎপর্য আমাদের কাছে বহন করে না ।'

পৃথিবীতে আভির্ভূত হওয়ার পর থেকেই মানুষ নিজেকে প্রশ্ন করেছে 'আমি কোথা থেকে এলাম? আমার চারপাশে যা দেখছি প্রকৃতি, নিসর্গ, বৈচিত্র্যময় প্রাণিজগৎ, অপার রহস্যঘেরা মহাবিশ্ব –তার সাথে আমার সম্পর্ক কী?' এই প্রশ্নকে আবর্তিত করেই মানুষ নির্মাণ করেছে সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি– মহা বিশ্বলোকের রহস্য উন্মোচনের চাবিকাঠি প্রায় তার হাতের মুঠোয়। তবুও যুগ যুগ ধরে ভাবুক, জ্ঞানসাধক, সত্যসন্ধানী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী এমনকি সাধারণ মানুষ বারবার নিজেকে প্রশ্ন করেছে এই যে জগৎ আমরা আমাদের চারপাশে দেখি, তা কী বাস্তব না কেবলই অপাত 'প্রতীয়মান' (appearance)? এটি যদি 'প্রতীয়মান' মাত্র হয় তাহলে এর পেছনে কী কোন বাস্তবতা রয়েছে? এই বাস্তবতা কি ঐশ্বরিক, এবং এর সাথে দৃশ্যমান জগতের সাথে সম্পর্কই বা কি এবং কোথায়? নিরলস বিজ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি তা কি valid? এসব প্রশ্ন মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে আসছে যখন থেকে সে দর্শনসুলভ চিন্তাধারা করতে শিখেছে– ধর্মগ্রন্থের শেখানো বুলি যখন তাকে আর সন্তুষ্টি দিতে পারে না। চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হল, বিংশ শতাব্দীর দুই শ্রেষ্ঠ মনীষার আলাপচারিতা এই 'শাশ্বত প্রশ্ন নিয়েই শুরু হয়– বাস্তবতার প্রকৃতি' বা স্বভাব নিয়ে (nature of reality)। বিজ্ঞানীই শুরু করেন কবিকে এই প্রশ্ন দিয়ে যে, তিনি ঐশ্বরিক সত্তায় বিশ্বাসী কি না, এবং এই সত্তার সাথে আপাতদৃশ্যমান বস্তু জগতের সম্পর্ক কি? এত বিষয় থাকতে আইনস্টাইন কেন এ প্রশ্নটি কবির কাছে উত্থাপন করলেন- এটি একটি বিস্ময় তো বটেই। তবে এর পেছনের ইতিহাসটি জানা থাকলে হয়তো বিষয়টি কিছুটা পরিষ্কার হবে। প্রথমত সে সময়টা একটি ক্রান্তির মধ্য দিয়ে আমরা অতিক্রম করছিলাম, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে অভাবিত বস্তুগত উন্নয়ন সাধিত হলেও বিশ্ব আর একটি মহাযুদ্ধের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছিল, শান্তিবাদী ও যুদ্ধবিরোধী বিক্ষুব্ধ আইনস্টাইন হয়তো পশ্চিমী বস্তুগত সভ্যতা– এর দার্শনিকতা নিয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন, তাই হয়তো প্রাচ্যের শান্তিময় রহস্যবাদের মধ্যে খুঁজতে চেয়েছিলেন সমাধান। আর সে সময় প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে হতে পারে? আর একটি বিষয়ও হয়তো বিজ্ঞানীর ভাবনার পশ্চাৎপট হিসেবে কাজ করছিল– তা হল গত কয়েক বছর ধরে ১৯২৭-১৯৩০ সাল পর্যন্ত দুটি সলভে সম্মেলনে নিলস বোরের সাথে আইনস্টাইন ভৌত বাস্তবতার স্বরূপ নিয়ে যে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তার রেশ হয়তো বিজ্ঞানীর মনে ক্রিয়াশীল ছিল। এরই বহিঃপ্রকাশ হয়তো ঘটেছিল কবিকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার মধ্যে। বোরের বক্তব্যের মূল সুর ছিল কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার আলোকে পর্যবেক্ষক অনপেক্ষ ভৌত বাস্তবতার কোনো অস্তিত্ব নেই, পরীক্ষণই নির্ধারণ করবে এই বাস্তবতার স্বরূপ। বিষয়মুখীন বাস্তবতা পরীক্ষণের মধ্য দিয়েই ধরা দেয়– এবং কোয়ান্টাম নিয়ম বলে দেয় ভৌত বাস্তবতার কোন উপাদানটি পর্যবেক্ষণীয়। অন্যদিকে কার্যকারণবাদী ও নির্দিষ্টবাদী আইনস্টাইন মনে করেন ভৌত বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষক অনপেক্ষ– এর একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে যার উপাদানগুলো তত্ত্ব ও পরীক্ষণের মাধ্যমে আমাদের কাছে ধরা দেয়।

পরবর্তীকালে 'কেনিয়ন রিভিউ' এ (Kenyon Review) আরও বিশদ আকারে দ্বিতীয় সাক্ষাতের বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশিত হয়। নোবেল পুরস্কারের একশত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 'কালচারস এন্ড ক্রিয়েটিভিটি' নামক জার্নালে এটি পুনরায় প্রকাশিত হয়।

এ প্রবন্ধে আমরা প্রথম দিনের বিষয় নিয়ে বা দ্বিতীয় দিনের প্রথম দিকের বিষয় নিয়ে আলোচনায় যাব না। আমাদের আলোচ্য হল আইনস্টাইনের সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকালে সঙ্গীত বিষয় নিয়ে উভয়ের আলোচনা। দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাতে আলোচনা বিচিত্র বিষয় নিয়ে ঘুরতে থাকে– পরিবার, জার্মান যুব আন্দোলন থেকে পদার্থবিদ্যার 'সম্ভাব্যতা', এবং নিয়তিবাদ। সবশেষে আলোচনার মোড় নেয় পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন দিককে স্পর্শ করে। কবি ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যের একটি দিক তুলে ধরেন তা হল পশ্চিমী সঙ্গীতের মত অত অনড় নয়, সঙ্গীতশিল্পীর সামান্য হলেও কিছুটা স্বাধীনতা আছে– যার মাধ্যমে গায়ক কিছুটা সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। এটিকেই তিনি বলেছেন, 'স্থিতিস্থাপকতার উপাদান– কিছু স্বাধীনতা সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতার হলেও রয়েছে যা আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সহায়ক'। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ইউরোপীয় সঙ্গীত হল মহাকাব্যের মত, কাঠামোর দিক থেকে এটি বিশাল গথিক নির্মাণশৈলীর সাথে তুলনীয়। কবির ভাষায়, 'পশ্চিমী সঙ্গীত আমাকে অভিভূত করে, এর বিশাল কাঠামো, এবং এর মহান রচনাশৈলী।' আইনস্টাইনের অবস্থান ছিল- আমাদের জানা উচিত, পশ্চিমী সঙ্গীত কী কেবলই প্রথাগত, নাকি মানুষের মৌলিক অনুভূতিকে স্পর্শ করে ? অবশ্য এই অনিশ্চয়তা আমাদের জীবনের অন্য দিক নিয়েও, আমাদের অভিজ্ঞতায় রয়েছে, রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যও- সেটি ইউরোপই হোক আর এশিয়াই হোক।

কবির জবাব ছিল এত বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও, একটি বোঝাপড়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা সমঝোতার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যে ব্যক্তিগত রুচি বা স্বাদ আমাদের সামনে রয়েছে তা থেকে আমরা ক্রমশ কি একটি সর্বজনীন প্রমাণের দিকে অগ্রসর হচ্ছি না ?

সঙ্গীত নিয়ে এই দুই মনীষীর আলাপচারিতার বঙ্গানুবাদ আমরা নিচে তুলে ধরলাম।

রবীন্দ্রনাথ : আমাদের ভারতীয় সঙ্গীত জগৎ ...পশ্চিমের মত এত দৃঢ় কাঠামোয় আবদ্ধ নয়। আমাদের সুরকারেরা এক ধরনের সুনির্দিষ্ট খসড়া-চিত্র বা বহিঃরেখা এঁকে দেন, অর্থাৎ একটি সুরের জগৎ এবং ছন্দোবদ্ধ ব্যবস্থা নির্মাণ করে দেন, আর সেই পরিসীমার মধ্যে থেকেও আমাদের শিল্পীরা সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ঘটান। তিনি একাধারে ঐ বিশেষ সুরের নিয়ম-নীতিগুলোর সাথে একাত্মতা বোধ করবেন, আবার একই সাথে সকল নির্দেশ মাথায় রেখে নিজের সঙ্গীতময় অনুভূতিগুলোর স্বতঃপ্রণোদিত প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। আমরা সুরকারের প্রতিভার প্রশংসা করি সঙ্গীতের সৃষ্টিশীলতার ভিত তৈরির জন্য, সেই সাথে এর অধিকাঠামোর চমৎকার নির্মাণশৈলীর কারণে। কিন্তু আমরা এও আশা করব, যেন সঙ্গীত শিল্পীর মাঝে স্বকীয় দক্ষতা যা সঙ্গীতময় ভাস্কর্য ও কারুকার্য সৃষ্টিতে সক্ষম। সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা অস্তিত্বের কেন্দ্রীয় নিয়মগুলো মেনে চলি, কিন্তু আমরা যদি নিয়মের ব্যত্যয় তাড়িত না হই, তাহলে আমাদের ব্যক্তিত্বের সীমার মধ্যে আমরা যথেষ্ট স্বাধীনতা উপভোগ করি যা আমাদের পরিপূর্ণ নিজ অনুভূতিগুলোকে বাঙময় করে তোলে।

আইনস্টাইন : সেটি তখনই সম্ভব যখন সঙ্গীতের একটি শক্তিশালী শৈল্পিক ঐতিহ্য মানুষের মনকে পথ দেখায়। ইউরোপে সঙ্গীত জনপ্রিয় শিল্প ও জনপ্রিয় অনুভূতি থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে এবং পরিণত হয়েছে তার নিজস্ব প্রথাসিক্ত ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এক পোপন শিল্পে।

রবীন্দ্রনাথ : তাহলে আপনাকে তো এই অতি জটিল সঙ্গীতের প্রতি একান্ত অনুরক্ত থাকতে হবে। ভারতবর্ষে একজন গায়কের স্বাধীনতার পরিমাণ তার নিজস্ব সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিহিত। তিনি সুরকারের বেঁধে দেয়া সুরে নিজের মত করে গাইতে পারেন, যদি তার সৃজনশীল ক্ষমতা প্রয়োগ করে সুরের সাধারণ নিয়মাবলীর ওপর নিজস্ব ব্যাখ্যা তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন – এই ব্যাখ্যা দানের অধিকার তার রয়েছে।

আইনস্টাইন : মূল সঙ্গীতের উঁচু ভাবটিকে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে হলে এর জন্য অনেক উঁচুমানের শিল্পবোধ থাকা চাই, যাতে একজন সুরকার তার ওপর ভিত্তি করে বৈচিত্র্য আনতে পারেন। আমাদের দেশে প্রায়শ বৈচিত্র্যকেও বিনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ : যদি আমরা আমাদের আচার-আচরণে মঙ্গলের নিয়মগুলো অনুসরণ করি, তাহলে আমরা প্রকৃতপক্ষেই পেতে পারি নিজেকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা। আচার-আচরণের মূল নীতি জানা রয়েছে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য, যা একে সত্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রদান করে তা হল আমাদের নিজস্ব সৃষ্টি। আমাদের সঙ্গীতে স্বাধীনতা ও বিনির্দিষ্ট ধারার মধ্যে দ্বৈততা রয়েছে।

আইনস্টাইন : গানের বাণীগুলোও কি মুক্ত ? অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, একজন গায়ক কি তার গাওয়া গানটিতে নিজের ইচ্ছেমত শব্দ (word) জুড়ে দেওয়ার স্বাধীনতা পেয়ে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ : হ্যাঁ। বাংলায় এক ধরনের গান প্রচলিত অছে যাকে কীর্তন বলা হয়। এতে এক ধরনের স্বাধীনতা থাকে যার ফলে গায়ক বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য, মূল গানে নেই এমন কিছু কিছু বাক্যাংশ যুক্ত করতে পারেন। এতে প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হয়, কারণ শ্রোতারা ক্রমাগতভাবে নতুন করে গায়কের যোগ করা অনুপম ও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে উদ্বেলিত হতে থাকে।

আইনস্টাইন : এই ছন্দোময়তা অর্থাৎ মাত্রাগত কাঠামো কি বেশ কঠিন ?

রবীন্দ্রনাথ : হ্যাঁ, খুবই। আপনি মাত্রিক সীমানাকে অতিক্রম করতে পারেন না; গায়ক তার সকল ভিন্নতায় ও বৈচিত্র্যে ধরে রাখবে ছন্দ ও সময়কে– যেগুলো একেবারেই অনড়। ইউরোপীয় সঙ্গীতে তুলনামূলকভাবে সময়ের স্বাধীনতা বেশি, কিন্তু সুরের ব্যাপারে মোটেই তা নয়। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতে সুরের ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু সময়ের স্বাধীনতা নেই।

আইনস্টাইন : ভারতীয় সঙ্গীত কি শব্দ (word) ছাড়াও গাওয়া যায় ? শব্দ ছাড়া গান গাইলে কেউ কি তা বুঝতে পারে ?

রবীন্দ্রনাথ : হ্যাঁ , আমাদের অবোধ্য শব্দেরও গান আছে, যে শব্দগুলো স্বরলিপির বাহক হিসেবে কাজ করে মাত্র। উত্তর ভারতে সঙ্গীত হল একটি স্বাধীন শিল্প, শব্দ ও ভাবনার ব্যাখ্যাদায়ী কোন প্রকাশ নয়, যা বাংলার সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। এই সঙ্গীত বেশ দুর্বোধ্য এবং সুক্ষ্ম, এবং নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সুরের জগৎ সৃষ্টি করেছে।

আইনস্টাইন : এটি কি বহুধ্বনি সূচক নয় ?

রবীন্দ্রনাথ : যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তা ঐকতান সৃষ্টির জন্য নয়, বরং ব্যবহৃত হয় সময়কে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে এবং সুরের ব্যাপকতা ও গভীরতা সংযোজনের জন্য। ঐকতান আনার জন্য আপনাদের সঙ্গীতে সুর কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ?

আইনস্টাইন : অনেক সময় প্রবলভাবে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক ঐকতান সুরকে একেবারেই গ্রাস করে ফেলে।

রবীন্দ্রনাথ : সুর আর ঐকতান হল যেন একটি চিত্রকর্মের রেখা ও রঙ। একটি সাধারণ সরলরৈখিক ছবি হয়তো সম্পূর্ণ সুন্দর, কিন্তু দেখা গেল রঙের সংযোজন এটিকে অর্থহীন আর তাৎপর্যহীন করে তুলল। তারপরও রঙ কিন্তু রেখার সাথে যুক্ত হয়ে একটি মহৎ চিত্রকর্ম সৃষ্টি করতে পারে, যতক্ষণ না এই সংযোজন ছবির গুণগত মানকে নিঃশেষ ও ধ্বংস করে ফেলে।

আইনস্টাইন : এটি একটি চমৎকার তুলনা; রেখা আবার রঙের চাইতে পুরনো। বোঝা যাচ্ছে, আপনাদের সুর কাঠামোগত দিক থেকে আমাদের চাইতে অনেক সমৃদ্ধ। জাপানি সঙ্গীত সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়।

www.mukto-mona.com

Pic: Tagore and Einstien : A memorable moment. (*Courtesy : mukto-mona :*)

রবীন্দ্রনাথ : আমাদের মনের ওপর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সঙ্গীতের প্রভাবের বিশ্লেষণ করা বেশ শক্ত। আমি পাশ্চাত্য সঙ্গীত দ্বারা দারুণভাবে আন্দোলিত হয়েছি– আমার অনুভূতিতে এ এক অসাধারণ সঙ্গীত, বিশাল ও ব্যাপক এর কাঠামো এবং এর মহান রচনাশৈলী। আমাদের নিজস্ব সঙ্গীতের গীতিধর্মী আবেদনের কারণে আমাকে স্পর্শ করে অনেক গভীরভাবে। ইউরোপীয় সঙ্গীত হল চরিত্রগতভাবে এক মহাকাব্য; এর বিস্তৃত পটভূমি রয়েছে আর কাঠামোর দিক থেকে এক বিশাল গথিক নির্মাণশৈলী।

আইনস্টাইন : হ্যাঁ, হ্যাঁ খুবই সত্যি কথা। আপনি কখন প্রথমবারের মত ইউরোপীয় সঙ্গীত শুনেছিলেন ?

রবীন্দ্রনাথ : সতের বছর বয়সে, যখন আমি প্রথমবারের মত ইউরোপে এলাম। বেশ অন্তরঙ্গভাবে তখন এ সম্বন্ধে জানতে পারি, তবে এরও আগে থেকে আমাদের নিজেদের বাসায় ইউরোপীয় সঙ্গীতের সাথে আমি পরিচিত হয়েছিলাম। অনেক ছেলেবেলাতেই আমি চোপিন এবং অন্যদের সঙ্গীত শুনেছিলাম।

আইনস্টাইন : আমরা ইউরোপীয়রা একটি প্রশ্নের উত্তর যথার্থভাবে দিতে পারি না, কারণ আমরা আমাদের নিজস্ব সঙ্গীতে অতি অভ্যস্ত। আমরা জানতে চাই আমাদের নিজস্ব সঙ্গীত কী প্রথাগত, অথবা এটি একটি মৌলিক গভীর মানবিক অনুভূতি; সুরের ঐক্য বা অনৈক্য সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি কি স্বাভাবিক, নাকি স্রেফ প্রথা হিসেবে গ্রহণ করে থাকি?

রবীন্দ্রনাথ : যেভাবেই হোক, পিয়ানো কিন্তু আমাকে হতবাক করে। আর বেহালা আমাকে পরিতৃপ্তি দেয় অনেক বেশি।

আইনস্টাইন : তরুণ বয়সে ইউরোপীয় সঙ্গীতের সাথে পরিচিত হয়নি, এমন একজন ভারতীয়ের ওপর ইউরোপীয় সঙ্গীতের প্রভাব নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক অনুশীলন হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ : একবার আমি একজন ইংরেজ সঙ্গীতজ্ঞকে আমার জন্য কিছু ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের বিশ্লেষণ করতে বলেছিলাম এবং তাঁকে ব্যখ্যা করতে অনুরোধ করেছিলাম ঠিক কোন উপাদানগুলো সঙ্গীতটির সৌন্দর্যকে বিকশিত করে।

আইনস্টাইন : সমস্যা হচ্ছে ভাল সঙ্গীত, তা পুবেরই হোক অথবা পশ্চিমেরই হোক, বিশ্লেষণ করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ : হ্যাঁ। যা শ্রোতাকে গভীরভাবে অভিভূত করে তা তার ধরাছোঁয়ার বাইরে।

আইনস্টাইন : এই একই অনিশ্চয়তা আমাদের, যা কিছু মৌলিক তাকে সব সময় ঘিরে থাকবে আমাদের অভিজ্ঞতায়, কোন শিল্পের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়ায়, তা ইউরোপীয় বা এশীয় হোক। এমনকি আমার সামনে আপনার টেবিলের ওপর রাখা যে লাল রঙের ফুলটি আমি দেখছি, তা আমার ও আপনার কাছে একই রকমভাবে প্রতিভাত নাও হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ : কিন্তু তবুও (দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য সত্ত্বেও) তাদের মধ্যে পুনর্মিলনের বা সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া চলমান– ব্যক্তি রুচির সাথে একটি সর্বজনীন প্রামাণ্যের মিলন সাধনের লক্ষ্যে।